Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 109 – 116
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : দাম্পত্য প্রেম ও নারী প্রকৃতি

শতাব্দী ধন
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dhanshatabdi96@hmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Nature, Conjugal love, Crisis, Fruitless love, Unemployment, Depression, Darkness, Silence.

Abstract

Jibananada's short stories were written in the 1930s between 1931 to 1936. The social impact of 30s permeated in his short stories but had no direct political impact. The social conditions of that time are reflected in his writings. In these stories the story teller has revealed the unemployment, depression, disappointment etc. created by the global recession market. He steers his story stories in a way that examines the lives of human beings. He created the characters of his stories as eternal characters in the perspective of an artist's eye on life. He has constantly experimented with the subject and style of the short story. He has chosen old values re-emerged for new times as the subject of his short stories. He has brought the rediscovered old spirit into art and life by making short story. In his short stories he brings out— the clash of the individual mind with urban-centred mechanized civilization, fatigue in civic life and character, despondence, indulgence and loneliness, Freudian psychology influences, skepticism of social family values and uncertainty, conflict between Marxist thought and traditional consciousness heartache and introversion cause by the desire of body and lust, atheism and death consciousness. Individuality can also be observed in terms of style as per the subject of the short story. The use of language in short stories— is a mixture of prose style and poetic style, stream of consciousness thinking and self-dialogue, natural consonants and philosophical symbolic construction, proverb, colloquial word, 'tatsama' and 'tatvaba' word, foreign word, simile, imagination etc. are used appropriately. He wants to break the old mould of the story to build it into new mould. In his short stories, he did not give much importance to the plots. He gave importance to the narrative of the story and the emotional conflicts of the characters.

The theory of love dominates in Jibananada Das's stories. Apart from this, there are presentation on the usefulness and implications of that theory in personal and family life. Marriage life gets important in the stories. The external and internal problems of the characters, surprise, disappointment, loneliness, sexuality, selifishness etc. are observed in the stories. In the most of the stories of Jibananda, hero is the main character. In the protagonists of the stories narrated by the first person or third person, the shadow of the individual Jibananda becomes evident. The protagonists of the stories are unemployed, helpless, introvert, wife's love deprived husband etc. It is almost as if the protagonists of a stories have no importance in their family. Wounded in the battle of life, these

heroes seek shelter in nature. The elements of nature also become the friend of these character's futile love. The misunderstanding of conjugal becomes the main theme in Jibananda's stories, which shakes the existence of their love as well as the existence of survival. The conflicts from the love become the basic idea in the stories. Which sometimes leads the hero or heroine to commit suicide or sometimes leads to extramarital affairs. Thus most of Jibananda stories have become melancholy hymns of daily life and thus in the world of Bengali prose literature, the genre of Bengali short stories has become an unique addition.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-কে আমরা অনুরাগী পাঠকসমাজ আদ্যন্ত একজন কবি হিসেবেই চিহ্নিত করে এসেছি। এই কবি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি যেন সরস্বতী নদীর মতোই অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় একশোটি ছোটগল্প ও বারো-তেরোটি উপন্যাস তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত লেখা সমস্ত ছোটগল্পগুলির মধ্যে তিনটি মাত্র গল্প 'অনুক্ত' পত্রিকায় তাঁর খুবই অনুরাগী পাঠকদের সৌজন্যেই প্রকাশিত হয়েছিল রচনার প্রায় ছত্রিশ বছর পরে এবং অন্যান্য ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর আরও পঁয়তাল্লিশ বছর পরে। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি পড়ে বোঝা যায়, উপন্যাসগুলি সৃষ্টিতে তিনি যতটা সময় নিয়েছেন, ছোটগল্পগুলি সেই তুলনায় খুব কম সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল এবং ১৯৩৬ সালে এই চার বছরে প্রায় একশোটি গল্প লেখা হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, জীবনানন্দ দাশ কতখানি দ্রুততার সঙ্গে এই গল্পগুলি লিখেছেন। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিকে অনেকে মনে করতেন তিনি এই গল্পগুলির স্রষ্টা নন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে এই গল্পগুলি তাঁরই হাতে প্রাণ পেয়েছে। আসলে কবি জীবনানন্দ যে এতটা আধুনিক জীবনের মাটিকে ছুঁয়ে গল্পের কাহিনী বুনন করতে পারেন, অনেকের কাছে এ ধারণা ছিল অকল্পনীয়।

জীবনানন্দ দাশের গল্পগুলো তাঁর একান্ত অন্তর্বদ্ধ ও অন্তর্বিদ্ধ কবি চেতনারই প্রকাশ। লাবণ্য দাশ (জীবনানন্দ দাশের স্ত্রী)-কে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> "কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, তবে এগুলো (গল্প) সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালে হয়ত থেকে যাবে।"[১]

তাঁর গল্পগুলি যে শুধুই যে ছাঁচে ফেলা গল্প তা নয়, গল্পগুলি সজীবতার প্রাণধর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত। এখনো পর্যন্ত জীবনানন্দের কিছু গল্প প্রকাশিত হয়নি। ১৯৮৬ পর্যন্ত তাঁর নয়টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। আরো দুটি ছোটগল্প উপন্যাসের নির্দেশনায় প্রকাশিত হলেও আসলে এগুলো ছোটগল্পই। এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি গল্প প্রথমে 'অনুক্ত' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পরে এই তিনটি গল্প সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায় (১৩৭৯) 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' শিরোনামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এরপর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতিক্ষা' পত্রিকায় ও এই পত্রিকারই 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত।

জীবনানন্দ দাশের গল্পগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়, যেন শুধুমাত্র সৃষ্টি নয়, তিনি এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে কিছু যেন একটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি যেন গল্পগুলি নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গল্পগুলিকে মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, কয়েকটি গল্পে প্রেমের তত্ত্ব প্রাধান্য পাওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন ও সংসার জীবনে সেই তত্ত্বের উপযোগিতা ও প্রভাব বিষয়ে বক্তব্য আছে। দুই, এই পর্যায়ের গল্পের বিষয়বস্তু সাধারণ দাম্পত্যজীবন। এই পর্যায়ের গল্পের সংখ্যাই বেশি। তিন, এই পর্বের গল্পগুলিতে শিল্পীর সমস্যা, শিল্প প্রক্রিয়া এবং শিল্পবিষয়ক অন্যান্য বিস্ময় রয়েছে। চার, এ পর্যায়ের গল্পগুলিতে বিষয়ের বৈচিত্র্য আছে, আছে ভাবনার অভিনবত্ব। এবার আমরা জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে দাম্পত্য প্রেমের ও নারী প্রকৃতির স্বরূপ কীভাবে অভিনবত্ব পেয়েছে তা নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেব—

প্রেম ব্যক্তিজীবনে বা দাম্পত্যজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা জীবনানন্দের কয়েকটি ছোটগল্প পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারি। যেমন—'প্রণয়-প্রণয়িনী'-তে প্রেমিকার দাম্পত্য জীবনের উপর নানাভাবে আঘাত করতে চাইছে তার পূর্বের প্রেমিক। এই গল্পে আমরা দেখব, বিরজা একদিকে যেমন তার স্বামী শশধরের প্রতি কর্তব্য, নিষ্ঠা, ভালোবাসার কোনো ত্রুটি করেনি তেমনি অন্যদিকে তার পূর্বের ভালোবাসার মানুষ রমেশকেও বিবাহিত জীবনে স্থান দিয়েছে। রমেশের প্রতি বিরজার প্রেমের যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন আছে তেমনি শশধরের প্রতিও বিরজার সম্মান, দাম্পত্য প্রেম অটুট আছে। বিরজার প্রেমের দুটো সত্ত্বাকে জীবনানন্দ এক সুদক্ষ কৌশলে ও সাবলীল ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন।

'জামরুলতলা' গল্পে গল্পকার দাম্পত্যজীবনের ক্লান্তির ভেতরেও যে প্রেম-ভালোবাসার স্মৃতি ও স্বপ্ন মানুষের মনের ভেতরে এক আশ্চর্য অবস্থানে থাকে তা দেখিয়েছেন। এই গল্পে প্রেমের স্বরূপটা একটু অন্যস্বাদের। অবনী ও হারানির দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কোথাও ক্লান্তির রেশ থাকলেও তাদের মধ্যে ভালোবাসাটা নিভে যায়নি। তাই হারানি আপ্রাণ চেষ্টা করে তার সেবা দিয়ে অবনীকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে অবনীর মৃত্যু হয়। হারানি চেয়েছিল তার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে কিন্তু সে পারেনি। তাই এই বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে সেও দুদিন পরে মারা যায়।

'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' গল্পে দেখব, সত্যব্রত বিবাহিত। তার বোন মাধুরী। মাধুরীর প্রেমিক শীতাংশু চিঠি লিখেছে কিন্তু মাধুরী সেই চিঠির কোনো উত্তর দিতে চায় না। মাধুরী মনে মনে শীতাংশুকে ভালোবাসে কিন্তু সে জানে শীতাংশুর সঙ্গে তার বিয়ে হবে না। এই কথা ভেবে মাধুরী কোনো উত্তর দেয় না। এরপর দেখব, দাদা সত্যব্রত বোনের এই তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের প্রশংসা করে। কারণ, প্রেমের হাত থেকে সত্যব্রত-র জীবনটা নিস্তার পেয়েছে। এখন তার জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে স্নিগ্ধতা, মাধুরী মিশ্রিত শান্তির মধ্যে দিয়ে। ভালোবাসার ভেতরে কোনো শান্তি নেই, সত্যব্রতর চোখে তাই ধরা দেয়,

> "ধানের ক্ষেত শীতে ও মৃত জ্যোৎস্নার অন্ধকারে, কষ্ট পাচ্ছে। জীবনে পুলকের দিন শেষ হয়ে গেছে যেন এই ধানগুলোর। ...ধানের ক্ষেতের মাথার ভিতর কি যে ব্যথা!"[২]

এই গল্পে প্রেমের আরেকটা স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে প্রেমের ত্যাগেই যেন জীবনের শান্তি উপলব্ধি করে সত্যব্রত। এরপরেও কেমন একটা বেদনা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে সত্যব্রত। প্রেমের এই সূক্ষ্ম টানাপোড়েনকে গল্পকার প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে একাত্ম করে তুলেছেন।

'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস' গল্পে প্রেমের স্বরূপ আবার একটু ভিন্ন। গল্পে দেখা যাবে, সুপ্রভার সঙ্গে প্রমথ-র বিয়ে হয়েছে। কিন্তু প্রমথ তার প্রথম ও শেষ ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে কল্যাণীকে ঘিরে। প্রমথর ভাবনায় কল্যাণীর চিত্রটিকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে গল্পকার খুব সূক্ষ্মভাবে রূপ দিয়েছেন—

> "ওর জীবনে রগড় ও রসের প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটা ফড়িংয়ের কীটের চেয়ে বেশি নয় তার, একটি নক্ষত্রের চেয়েও কম নয়... কিন্তু চিন্তার ও কল্পনার কোনো অনুভূতিকে জাগাতে সে বাকি রাখেনি। ...এই বোধের ভিতর নিরক্ষর ব্যথা-অপরিমেয় অমৃত।"[৩]

প্রমথ তার বিয়ের আগে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলবে বলে আলাদাভাবে ডেকেছিল কিন্তু প্রমথ লক্ষ করে কল্যাণী যেন অন্যমনস্ক। সে হয়তো প্রমথ সেভাবে ভালোবাসত না বলেই এই ধরনের উদাসীনতা তার মধ্যে কাজ করছিল। গল্পের কথক বলবেন—

> "ফসল যেদিন আসবে সেদিন প্রমথকে পাবে না।"[৪]

আসলে প্রমথ যেভাবে কল্যাণীর থেকে তার ভালোবাসাকে প্রত্যাশা করত, সেই ভালোবাসার কোনো চাহিদাই প্রমথর পূরণ হয়নি। কিন্তু প্রমথর ভাবনায় আঘাত হানে কল্যাণীর অন্যমনস্কতা, উদাসীন মনোভাব। এই জায়গার থেকে প্রমথর আক্ষেপের সুর গল্পে ধরা পড়ে ও সে সুপ্রভাকে বিয়ে করে। এখানে প্রেমের প্রকৃতির স্বরূপটা আলাদাগোছের। প্রমথ যখন তার ভালোবাসাকে পরিণত রূপ দিতে সক্ষম হয়নি তখন সে আর সেই নারীকে আঁকড়ে বা তার কল্পনাতে জীবন

অতিবাহিত করতে চায়নি, সে জীবনকে আরও নতুনভাবে পেতে চেয়েছে ও অন্য এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

দাম্পত্যজীবনের প্রণয়ের আরেকটি শেড 'করুণার পথ ধরে' গল্পে প্রতিফলিত হয়। এই গল্পের কথক আমি দাম্পত্য জীবন বর্ণনা করেছেন এই ভাবে,

> "একদিন সোনালী দিনের মতো আকাশের দিকে উড়েছিলাম পৃথিবীর কুহক দেখবার জন্য, রৌদ্রের এক গভীর রক্তিম প্রেমকে আস্বাদ করবার জন্য, কিন্তু কোথা থেকে মা ও মেয়ে এসে আমাকে শিকার করে নিয়ে গেল।"[৫]

সে মনে করে তার স্ত্রী এসেছে দুদিনের জন্য আর মেয়েটি এসেছে দু-দণ্ডের জন্য। তার নির্দিষ্ট কোনো চাকরি নেই। সে দুটো টিউশান পড়ায় ও তার একটি দেশী কাচা সাবানের দোকান আছে। এই সাবান বিক্রির জন্য তাকে মানুষকে খোসামোদ করতে হয়, যা তার একেবারেই পছন্দের নয়। তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, অমলা চৌধুরী এখন কোথায়? সে হয়তো ভাবে, অবিনাশ ঘোষাল গেল কোথায়? এই অবিনাশ অমলার সঙ্গে নিজের কাল্পনিকতার রঙে রাঙানো প্রেমের অনুভব করে বলে,

> "বাবলা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার সঙ্গে হিজলের ডালপালার যে করুণ আশ্চর্য গন্ধধরা পড়ে, নক্ষত্রের দিন রাতে জীবনের নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে সেই রহস্যময় ঘনিষ্ঠতা আমাদের দুজনের জন্য নয়।"[৬]

এই প্রেমের স্মৃতিচারণায় ও উপলব্ধিতে একটা আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সাধারণ দাম্পত্য বিষয়ক গল্পগুলির পুরুষ চরিত্রগুলি মোটের ওপর প্রায় একই ধরনের। কিন্তু নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। উপরিউক্ত গল্পে ও অবিনাশ নামক পুরুষ চরিত্রটি বাস্তবিক জীবনে কোনো সাফল্য পায়নি। তার চাকরি নেই, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, একান্নবর্তী পরিবারে অন্যের অনুগ্রহে থাকে। এই অবিনাশের মনে হয়েছে,

> "অনেকখানি কাজের বিনিময়ে অনেক কম টাকা পাই। ... স্বপ্নই গভীর একটা—স্বপ্ন ও মনন।"[৭]

সাফল্য না পেয়েও সে হীনমন্যতায় ভোগে না, তার একটা নিজস্ব মনোজগৎ আছে সেখানে তার অবাধ বিচরণ। তার স্ত্রী তার মনোজগতের কোনো খবর সেভাবে রাখে না বললেই চলে। এটা অনিমেষ অনুভব করে কিন্তু এ নিয়ে সে তার স্ত্রীকে কিছু বলে না। এই অনিমেষ চরিত্রের সঙ্গে কোথাও গল্পকার ও কবি জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গল্পগুলির রচনাকাল একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই সময় পর্বে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। সেই আপাত-ব্যর্থ পটভূমিতে দাম্পত্যজীবন যে কী দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা একেবারেই যারা কাছের মানুষ ছিলেন তারা কেউই তাঁর কোনো খোঁজ-খবর রাখতেন না। এই জীবন পর্যায়ের প্রতিফলন তাঁর 'করুণার পথ ধরে' ও অন্যান্য ছোটগল্পেও স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

পুরুষ চরিত্রের বিপরীতে থাকা নারী চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ছোটগল্পে নারীর চরিত্র ও জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। যেমন—

১. 'আস্বাদের জন্ম' গল্পে গল্পকারের মনন থেকেই স্ত্রী চরিত্রের জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন,

> "রূপ অন্ধকার জলের গোপনতার ভিতর আশ্বস্ত হয়ে থাকবার জিনিস পৃথিবীর মৃত্তিকায় এসে তা হয়ে যায় মৃত মাছের মতো।"[৮]

এই গল্পে প্রতিটি নারী চরিত্রেরই এই এক রকমের যাপনচিত্র।

২. নারীদের রূপের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন সাপের সঙ্গে। অবশ্যই তা রহস্যময়তা বোঝাতে, হিংস্রতা বোঝাতে নয়। তাই পুরুষ চরিত্রের কণ্ঠে গল্পগুলিতে দেখা যায় এই তুলনার প্রসঙ্গ। 'এক এক রকম পৃথিবী' গল্পে অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় অবিনাশ নামক এক পুরুষ চরিত্র বলে,

> "সাপের সুন্দর শরীর পৃথিবীর রূপমতীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এরা রয়েছে বলে পালঙ্কের আবছায়ায়, নিস্তব্ধতা জমে ওঠে।"[৯]

৩. আবার নারীকে গোখরো, তক্ষকের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। যেমন, 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পের কথক আমি তার মাকে চিঠিতে লিখে বলছে, তার স্ত্রী চারুলতাকে তক্ষকের সঙ্গে, শঙ্খচূড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে আবার পূর্বে উল্লিখিত গল্প 'এক এক রকম পৃথিবী'-তে দেখি কুঞ্জবাবুর প্রশ্নে অবিনাশ রূপসীদের গোখরো বলে উত্তর দিচ্ছেন।

৪. নারী সৌন্দর্যকে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ উপাদান ও রূপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'অসুস্থ রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পে দেখব, একদিন কথকের বাড়িতে কেউ নেই, তারা আসলে জীবিত না মৃত তা স্পষ্ট নয়। কথক আমি বলছে, কুয়াশার ভেতর থেকে ঘাসের গন্ধ পাওয়া যায়, রূপসী সর্পিনী যেন পাশেই কোথাও ছিল, ওরা যেন হৃদয়কে আড়ষ্ট করার জন্য গেছে আর গেছে তাকে ব্যথা দেবার জন্য। আবার, 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে গল্পের নায়ক চিঠিতে তার মাকে তার স্ত্রী চারুলতা সম্পর্কে বলছে, তাদের জীবনের যবনির ওই প্রান্তে যাদের কোনোদিন দেখতে পাওয়া যায় না, সেই কুয়াশায় মাখা সম্ভাবনার রাজ্যের যেন এক মমতাময়ী রূপসী। এই হবে হয়তো তার স্ত্রী চারুলতা।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংসার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আরও নানা ধরনের দাম্পত্যজীবন কেমন হতে পারে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করেছেন বেশ কিছু গল্পে। আমরা এই জাতীয় গল্পগুলিতে দেখব, দাম্পত্যজীবনগুলি অধিকাংশই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা কেন ঘটছে, কীভাবেই বা এই ব্যর্থতার থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়, কীভাবেই বা নর-নারীর এই সম্পর্ক মেরামতির জন্য বা উপকরণ ব্যবহারে কী ফলাফলে ঘটবে— এসব নিয়েই জীবনানন্দ প্রধানত অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে—

এক, 'বাসরশয্যার রাতে' শীর্ষক গল্পে প্রধান স্ত্রী চরিত্র হল নীহার। সে শুধুমাত্র নিজের ভালো থাকার কথা ভাবে। সে বিয়ের আগে চারুকে ভালোবাসত। কিন্তু চারুদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল তা নয়, তবে বলা ভালো মোটের ওপর সচ্ছল ছিল। কিন্তু চারুদের খড়ের ঘরে সব কাজই করতে হত চারুকে। তাই সে চারুকে বিয়ে করে না। বিয়ে করে সে কলকাতায়। সে তার স্বামী দেবব্রতকে নানা প্রসাধন সামগ্রী আনবার ফারমাস দেয়। কিন্তু স্বামী দেবব্রতর ভালোবাসার সে কোনো মর্যাদাই দেয় না।

নীহারের মতই মানসিকতার নারী চরিত্র 'শাড়ি' গল্পেও দেখা যায়। গল্পের স্ত্রী চরিত্র ঊষা তার স্বামীর আর্থিক অসুবিধে আছে জেনেও দামী দামি শাড়ি কেনে বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে। ঊষার এই ধরনের হিংস্র লিপ্সার কাছে রণজিৎ (ঊষার স্বামী)-এর নিজেকে মানুষ বলে মনে হয় না। এই নারী চরিত্রটি প্রবল ভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

'বত্রিশ বছর পরে' গল্পে নায়িকা চরিত্র স্বর্ণ-র স্বার্থপরতা অভয়কে হতাশ করে। স্বর্ণ যখন শোনে লুচি, মাংস এসেছে তখন সে নিজে খেতে চলে যায়। কিন্তু তার স্বামী অভয়কে সে খেতেও বলে না। সে নিজে পেটপুরে মাংস খায়। তার স্বামীর খাবারের কথা ভাবেই না। এক আত্মসুখী নারীচরিত্রকে গল্পকার অঙ্কন করেছেন।

দুই, দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হল অতিরিক্ত স্বামীনির্ভরতা। 'রক্তমাংসহীন' গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে নেব। তার বাপের বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সে চায় তার স্বামী তাকে যেতে বারণ করুক। তার স্বামী ঊষার মনোভাব বুঝতে পেরেও কিছু বলছে না। সিদ্ধান্তটা সে পুরোপুরি ঊষার উপরই ছেড়ে দিয়েছে। সে একবার যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে তারপরে সে ভাবছে সে তার স্বামীর অনুমতি না পেলে যাবে না। কিন্তু তার স্বামীর নিরুত্তর, উদাসীন, নিষ্প্রভ মনোভঙ্গি ঊষাকে ব্যথিত করে। শেষ পর্যন্ত সে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। কিন্তু ঊষা আর তার স্বামীর কাছে ফিরল না, কেননা ততদিনে ঊষার মৃত্যু হয়ে গেছে। ঊষা তার স্বামীর প্রতি মানসিক দিক থেকে এতটাই নির্ভরশীল ছিল যে, তার স্বামীর জীবনে তার স্ত্রী থাকা বা চলে যাওয়ায় যে কোনো প্রভাব পড়বে না এই মনোভঙ্গিটাই ঊষাকে চরমভাবে ব্যথিত করে তোলে। যার চূড়ান্ত ফল হিসাবে দেখা যায়, ঊষার মৃত্যুতে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

তিন, নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কে ব্যর্থতার কারণ। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোনো সম্মান নেই, ভালোবাসা নেই, মমত্ববোধ নেই, আছে শুধুমাত্র দাবি। এর ফলে নির্যাতনের শিকার হয় পুরুষ। 'নিরুপম যাত্রা' ও 'পূর্ণিমা' গল্পে এই নির্মম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

চার, দাম্পত্য সম্পর্ক যখন শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের কামনার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও দাম্পত্য চিরস্থায়ী হয় না। এই ধরনের জৈবিক চাহিদা পূরনের পরে সম্পর্কের মধ্যে ক্লান্তি কাজ করে যা দাম্পত্যে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দাম্পত্যের এই জাতীয় চিত্র গল্পকার জীবনানন্দ দাশ 'তিমিরময়', 'মেয়ে মানুষের রক্ত মাংস', 'সাত কোশের পথ' গল্পগুলিতে সুনিপুণ দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন।

পাঁচ, গল্পকার জীবনানন্দ দাশ তার সৃষ্ট গল্পগুলিতে কখনো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উদাসীনতা বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উদাসীনতাকেও দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমে তলানিতে ঠেকে যাওয়ার কারণ হিসেবেও নির্দেশ করেছেন। যেমন, 'বিবাহ অবিবাহ' গল্পে সরযূ অমূল্যকে বলে সংসারে তার অনেক কাজ থাকে, অমূল্যর জন্য তার কোনো সময় নেই। এই যে নির্লিপ্ত উদাসীন মনোভাবই ক্রমে তাদের সম্পর্ককে শেষের দিকে নিয়ে যায়। 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে দেখা যায়, অনাদি একা থাকে, যক্ষা হয়েছে তার। অনাদির স্ত্রী তাদের মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায় রমেশের সঙ্গে। অনাদি বলে আজকাল পুরুষদের বিমর্ষ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কেননা, নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ তো আর যেতে পারে না কখনো। এরপর দেখব, অনাদির মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু তার স্ত্রী ও রমেশের এতে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। স্ত্রী চরিত্রটির রমেশের প্রতি উদাসীনতাই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

ছয়, নারী বা পুরুষের বিবাহের পূর্বের প্রণয় সম্পর্ক বা বিবাহ পরবর্তী বিবাহ বর্হিভূত কোনো প্রণয়ের সম্পর্কও দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হিসেবেও গল্পকার পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। যেমন, 'কিন্নরলোক' গল্পে সরযূ দেখতে সুন্দরী, তার স্বামী সুরেশ। সুরেশ সরযূকে নিজের সমস্ত জমে থাকা অনুভূতি, কল্পনা দিয়ে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু সরযূ তার ভালোবাসার কণামাত্র সম্মান করে না, কেননা তার আগেই সুবোধ সরযূর মন জয় করে নিয়েছে। এইভাবেই সরযূ ও সুরেশের দাম্পত্য সম্পর্ক কোনো মূল্য পায় না।

আবার, 'করুণার পথ ধরে' গল্পে দেখা যায়, অবিনাশ ঘোষাল নামক পুরুষ চরিত্রের মননে পূর্ব প্রণয় অমলা চৌধুরীর উপস্থিতিও তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

'প্রেমিক স্বামী' গল্পেও দেখা যায়, মলিনা একাই থাকে। ভুজঙ্গবাবুদের বাড়িতেই সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। স্বামী প্রভাতের অনুভূতি, ভালোবাসার মর্যাদা নেই মলিনার কাছে। প্রভাত ভেবেছিল, মলিনা তার থেকে দূরে থাকলে হয়তো প্রভাতের প্রতি ভালোবাসার সূচনা ঘটবে। তাই তাকে ভুজঙ্গবাবুদের সঙ্গে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সে দিল্লীতে গিয়ে দেখে, মলিনার আনন্দ, উন্নতি, ভালোলাগা, ভালোবাসা সবকিছুই সম্পর্ককে ঘিরে। প্রভাত সবই বুঝতে পেরে যায়, যে মলিনার জগতে সে আর কোথাও নেই। এ ভাবেই পরিস্থিতি প্রভাত ও মলিনার দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টেনে দেয়।

সাত, অবসাদ বা তীব্র অভিমানকেও গল্পকার নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যেও থাকা সুন্দর জীবনযাপনের সমাপ্তিকেই সূচিত করে। যেমন, 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পের কথক আমি চরিত্রটির পাঁচ বছর হয়েছে কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে তাদের কোনো সন্তান হয়নি। মায়ের কথায় তার তীব্র অভিমান হয়। এই সময় তার স্ত্রী কল্যাণী বাড়িতে ছিল না। তার তখন গায়ে জ্বর। এরকম অবস্থায় সে মায়ের পাঁচ বছর হল এখনো ছেলে হয়নি এই ধরনের কথা বারবার শুনতে শুনতে তীব্র অভিমানে আত্মহত্যা করে নেয়।

আবার 'অঘ্রানের শীত' গল্পে দেখা যায়, ঊষার স্বামীর কোনো নির্দিষ্ট কর্মসংস্থান নেই, তবুও তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে স্বচ্ছতা আছে। এরপর ঘটনার অগ্রগতির সাথে সাথে দেখা যায়, উমার স্বামী কলকাতাতে চাকরীর খোঁজে যায়। উমার তখন একা, তাকে চারিদিকের অবসাদ, শূন্যতা গ্রাস করে। এই উমা একদিন অবসাদ কাটিয়ে উঠতে না পেরে আত্মহত্যা করল। একাকীত্বের থেকে সৃষ্ট শূন্যতা ও ক্রমে তা অবসাদ পরিণত হয়েই উমা এই আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

আট, তথাকথিত সফল দাম্পত্যের চিত্র ও জীবনানন্দের কয়েকটি গল্পে ধরা পড়ে। যেমন, 'সাতকোশের পথ' গল্পে প্রবোধ ও ঊর্মিলার দাম্পত্য সম্পর্ক। তারা জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এতে তারা সফলও হয়েছে। তাই গল্পকার বলছেন,

> "এরপর একদিন ঊর্মিলা স্বামীর কাছে প্রাপ্য পুরস্কার পেল, আদায় করে নিতে হয়নি, স্ত্রীকে দেওয়াই নিয়ম। রোমহর্ষ নেই, নতুন আবিষ্কার নেই, চমক নেই, না আছে কোনো বিরক্তি।"[১০]

জীবনানন্দ এই গল্পের শেষাংশে এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাদের সুখী ও সফল দাম্পত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের গল্পও জীবনানন্দ লিখেছেন। দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে নারী-পুরুষের চরিত্রের উপর তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'উপেক্ষার শীত' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, অরু তার প্রেমিক শরদিন্দুর থেকে কোনো ভালোবাসাই প্রত্যাশা করে না। শরদিন্দুর থেকে বোনের মতো স্নেহই তার কাঙ্ক্ষিত। হেমনলিনীর সঙ্গে শরদিন্দুর দাম্পত্যের প্রকৃতিটা বুঝতে পারে অরু। অবশ্য অরু শরদিন্দুর জীবনে না এলে সে প্রেমও বুঝত না, অপ্রেমও না। তাই অরু চায়, বৌদিকে খুব ভালোবাসুক স্ত্রীর মতো আর তাকে,

> "অরু দাক্ষিণ্যই চাচ্ছে, স্নেহ চাচ্ছে মাত্র। বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতার কি শেষ হয়?"[১১]

প্রেমের এক অভিনব দিক গল্পকার সুনিপুণ দক্ষতায় এই গল্পে অঙ্কন করেছেন।

জীবনানন্দের ছোটগল্পে এভাবেই বৈচিত্রময়ী নারী ও তাদের দাম্পত্য প্রকৃতির স্বরূপ বিস্তৃত রয়েছে। মনে হয় যেন তারা গল্পকারের সমস্ত ছোটগল্প জুড়েই আধিপত্য বিস্তার করে গেছে। এই নারী চরিত্ররা কখনও পাঠকহৃদয়কে করেছে উদ্বেল কখনো বা করেছে নিরাশ। একদিকে তিনি যেমন নারী ও পুরুষ চরিত্র নিয়ে বিশেষত নারী চরিত্র নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন, তাদের স্বরূপকে বুঝতে চেয়েছেন, তেমনি যেন প্রতিপন্নও করতে চেয়েছেন বিশেষ কিছু বিষয়ও যেমন, দাম্পত্য জীবনে প্রেমের প্রয়োজন আছে, কোথাও কোথাও দেখিয়েছেন সন্তানের থেকেও দাম্পত্য বড়ো। নারীর রূপকে প্রকৃতির উপাদানের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন জীবনানন্দ। আবার কোথাও তিনি বলেছেন নারীর রূপ আলাদাভাবে সৃষ্টি করা যায় না। রূপ যদি থাকে তাহলে তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। আবার কোনো কোনো দাম্পত্যের মধ্যে ভালোবাসা নেই, আছে করুণা, আছে বিষাদ, আছে অবসাদ যা থেকে নারী বা পুরুষ মুক্তি কামনা করেছে। এই মুক্তি দেখা যায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটে। এই সমস্ত উপকরণ দিয়েই গল্পকার জীবনানন্দ নারীর অনন্যতা, প্রেম-ভালবাসার প্রগাঢ় অনুভূতি দিয়ে দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে ও নারীর প্রকৃতির স্বরূপ পর্যালোচনায় সার্থকতা এনেছেন।

Reference:

১. চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ), ২০০৩, পৃ. ৩৭২

২. বঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পাদিত, 'জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র', গতিধারা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২১শে বইমেলা, 2000, পৃ. ৮৬

৩. ঘোষ, শঙ্খ, 'জীবনানন্দ : গদ্যপ্রতিমা', মাঝি, কলকাতা, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ.- ১৬

৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, 'বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ৩৫৮

৫. পাঠক, অতীন্দ্রিয়, 'জীবনানন্দের গল্পে প্রেম ও নারী', 'অনুষ্টুপ', শীত সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩৯

৬. মুস্তাফী, সুবিনয়, 'জীবনানন্দ দাশের তিনটি গল্পঃ পুনর্ভাবনা', একদিন শতাব্দীর শেষে', জীবনানন্দ স্মারক সংকলন, মার্চ, ২০০০, পৃ. ৭৩

৭. ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, 'জীবনানন্দের ছোটগল্পে আধুনিকতা এবং জীবনবোধ', 'শিলীন্ধ্র', জীবনানন্দ সংখ্যা, ৩য়

সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫, পৃ. ৭৮

৮. রাজা, সুব্রত, 'বোধ করোজ্জল কারুভাষা জীবনানন্দের গল্প', 'উত্তরধ্বনি', কলকাতা, শারদ সংখ্যা, ১৪১২, পৃ. ৩০৯

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনানন্দের গল্প উপন্যাস: সংলগ্নতা অসংলগ্নতা', জীবনানন্দ অকাদেমী পত্রিকা, চার সংখ্যা, পৃ. ১২০

১০. ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, 'জীবনানন্দের ছোটগল্পে আধুনিকতা এবং জীবনবোধ', শিলীন্ধ্র, জীবনানন্দ সংখ্যা, ৪র্থ সংখ্যা, পৌষ, ১৪০৫, পৃ. ৯৭

১১. পত্রী, পূর্ণেন্দু, 'গল্পের জীবনানন্দ', মাঝি, শারদ সংখ্যা (জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা), কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৯৫